কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৬
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৬

সূরা আল হুজুরাত (১-১০ আয়াত)

সূরা আল হুজুরাত কুরআনের ৪৯ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৮ এবং এর রূকু ২। সূরা আল হুজুরাত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। "আল-হুজুরাত" (الحجرات) হলো 'হুজরা' (হুজরাহ) শব্দের বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ 'বাসগৃহসমূহ', 'কক্ষসমূহ' বা 'প্রকোষ্ঠসমূহ'

নামকরণ

৪ আয়াতের إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আল হুজরাত শব্দ আছে এটি সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সূরার বিষয়বস্তু থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া হুকুম-আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, ঐ সব হুকুম-আহকামের বেশীর ভাগই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। যেমনঃ ৪ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারদের বর্ণনা হচ্ছে আয়াতটি বনী তামীম গোত্রে সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো যার প্রতিনিধি দল এসে নবীর (সা.) পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরা বা গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলো। সমস্ত সীরাত গ্রন্থে হিজরী ৯ম সনকে এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ ৬ আয়াত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে বনী মুস্তালিক গোত্র থেকে যাকাত আদায় করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। একথা সবারই জানা যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে এমন আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া, যা তাদের ঈমানদারসূলভ স্বভাব চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে যেসব আদব-কায়দা, ও শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথম পাঁচ আয়াতে তাদেরকে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি খবরই বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে কোন কর্মকাণ্ড করে বসা ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কওমের বিরুদ্ধে কোন খবর পাওয়া যায় তাহলে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে খবর পাওয়ার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য কি না। নির্ভরযোগ্য না হলে তার ভিত্তিতে কোন তৎপরতা চালানোর পূর্বে খবরটি সঠিক কি না তা যাঁচাই বাছাই করে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোন সময় পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত।

তারপর মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ জিনিস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা এগুলো এমনিতেও গোনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে নাম ধরে ধরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতপর গোত্রীয় ও বংশগত বৈষম্যের ওপর আঘাত হানা হয়েছে যা সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশের নিজ নিজ মর্যাদা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করা, অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করা এবং নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের হেয় করা--- এসব এমন জঘন্য খাসলত যার কারণে পৃথিবী জুলুমে ভরে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ছোট্ট একটি আয়াতে একথা বলে এসব অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন যে, "সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য, গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য নয় এবং একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য আর কোন বৈধ ভিত্তি নেই।"

সবশেষে মানুষকে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয়, বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করা। সত্যকার মু'মিন সে যে এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোন মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

১. হে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাকা' ইবন মা'বাদ ইবন যুরারাহর নাম প্রস্তাব করলেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আকরা' ইবন হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হলো এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয় । [বুখারী: ৪৮৪৭]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না- এর অর্থ হলো, দ্বীনের ব্যাপারে নিজে থেকে কোন ফায়সালা করো না (কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না, কোন ফতোয়া দিয়ো না)। এবং স্বীয় বিবেক-বুদ্ধিকে তার উপর প্রাধান্য দিয়ো না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের সাথে কোন কিছু সংযোজন বা বিদআত রচনা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অতিক্রম করার এমন দুঃসাহসিকতা, যা

কোন ঈমানদারের জন্য শোভনীয় নয়। অনুরূপ কুরআন ও হাদীস নিয়ে যথাযথ গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা না করে কোন ফতোয়া দেওয়া যাবে না এবং ফতোয়া দেওয়ার পর যদি এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধির প্রতিকূল, তবে তার উপর অটল থাকাও এই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের পরিপন্থী। মু'মিনের কর্তব্যই হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলীর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দেওয়া। নিজের কথা অথবা কোন ইমামের মতের উপর অনড় থাকা তার কর্তব্য নয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন। তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল নবীর সাথে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন ঈমানদাররা তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ্য রাখেন। কারো কণ্ঠ যেন তার কণ্ঠ থেকে উচ্চ না হয়। তাকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে কোন কথা বলছে। তাই সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তার সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না। যেমন পরস্পর বিনা দ্বিধায় করা হয়; কারণ তা এক প্রকার বে-আদবি ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। তারা এরপর থেকে খুব আস্তে কথা বলতেন। সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন। [দেখুন: বুখারী: ৪৮৪৬, মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৩৭]

অনুরূপভাবে রাসূলের কোনো সুন্নাত সম্পর্কে জানার পরে সেটা মানতে গড়িমসি বা সামান্যতম অনীহা প্রকাশ করাও বে-আদবি। এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অধীন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুজরা মোবারকের সামনেও বেশি উচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই তার পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বললঃ আমরা তায়েফের লোক। তিনি বললেন, যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে তবে আমি তোমাদের বেত্রাঘাত করতাম। তোমরা রাসূলের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছ কেন? [বুখারী: ৪৭০]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

৩. নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

অতঃপর যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি তাদের অন্তরকে যাচাই ও পরীক্ষা করেছেন, যার ফলস্বরূপ এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, তাদের অন্তর তাকওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে গেছে। এরপর আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা সকল অকল্যাণ ও অপছন্দনীয় বিষয় দূর করে

দেয়। সাথে সাথে তিনি এমন মহান প্রতিদানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার বর্ণনা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আর মহান প্রতিদানের মধ্যে রয়েছে সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ।

এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ আদেশ, নিষেধ ও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে অন্তরসমূহকে যাচাই করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশকে আঁকড়ে ধরে, তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সেদিকে দ্রুত ধাবিত হয় এবং নিজের প্রবৃত্তির উপর তাকে প্রাধান্য দেয়, তার অন্তর তাকওয়ার জন্য খাঁটি ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং এর জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়। আর যে এমনটি করে না, তার সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তাকওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

৪. নিশ্চয় যারা হুজরাসমূহের পিছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৫. আর আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তবে তা-ই তাদের জন্য উত্তম হত। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বানী তামীম গোত্রের কিছু অজ্ঞ লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা দুপুর বেলায় নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশ্রামের সময় আগমন করে। তাদের কাছে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে আসার পূর্বেই ডাকতে শুরু করে, হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে বেরিয়ে আস, এরূপ কথা বলে ডাকতে থাকে। তখন (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ...) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ: ৩/৪৮৮, সহীহ) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করে বলছেন, তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। ডাকাডাকি না করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করত তাহলে এটা তাদের জন্য উত্তম ছিল। এ আয়াত নাযিল হলে আবূ বকর (রাঃ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার শপথ আমি আমার আওয়াজ কখনো উঁচু করব না, নিচু আওয়াজে কথা বলব। (মুসনাদ আহমাদ হা. ১৫৭০০, সহীহ)

প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে الْحُجُرَاتِ বলা হয়। যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে।

সাহাবী ও তাবোয়িগণ তাদের আলেম ও উস্তাদ-মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, আমি যখন কোনো আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোনো হাদিস লাভ করতে চাইতাম, তখন তার গৃহে পৌছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তার কাছে হাদিস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেনঃ হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাত ভাই। আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলতেনঃ আলেম কোনো জাতির জন্যে নবী সদৃশ। আল্লাহ তা'আলা নবী সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তার বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। [দারমী: ২/১২৩, ১২৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩৩৪, ৫৮১৩, ৬৩৫৫, ৮০৭৫]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

৬. হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, বনিল-মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পিতা হারেস ইবনে দ্বিরার বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করতঃ যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললামঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে আমি তাদের যাকাত একত্রিত করে আমার কাছে জমা রাখব।

আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোনো দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো দূত আগমন করল না, তখন হারেস আশঙ্কা করলেন যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। হারেস এই আশঙ্কার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিত তারিখে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তার পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তারা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন।

এদিকে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হলো এবং ওদিকে হারেস জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনারা কোন গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হলোঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ ও তার প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হলো এবং ওলিদের এই বিবৃতিও শুনানো হলো যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। এ কথা শুনে হারেস বললেনঃ সে আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলিদ ইবনে ওকবাকে দেখিওনি। সে আমার কাছে যায়নি।

অতঃপর হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেনঃ কখনই নয়; সে আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশঙ্কা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোন ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৭৯, ৩/৪৮৮]

وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ

৭. আর তোমরা জেনে রাখা যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং সেটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের কাছে অপ্রিয়। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি মুহাম্মাদ (সঃ) বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনতেন এবং সেই মুতাবেক কাজ করতেন তবে তোমরাই কষ্ট পেতে এবং তোমাদেরই ক্ষতি সাধিত হতো। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "যদি সত্য প্রতিপালক তাদের চাহিদা বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলেন তবে আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যেতো, বরং আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ পৌঁছিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ হতে বিমুখ হয়ে যায়।" (২৩:৭১)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ইসলাম প্রকাশ্য এবং ঈমান অন্তরের মধ্যে রয়েছে।" অতঃপর তিনি তিনবার বীয় হাত দ্বারা স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করেন। তারপর বলেনঃ "তাকওয়া এবানে, তাকওয়া এখানে।" (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন) মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ কুফরী, পাপাচার, অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। আর এই ভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ফিরে যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ "তোমরা সোজাভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাও, আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করবে।" তখন জনগণ তার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করে বলতেন :
اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ
হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দাও এবং আমাদের অন্তরকে তা দ্বারা সুশোভিত করে দাও। আমাদের নিকট কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতা অপছন্দনীয় করে দাও। আমাদেরকে সুপথ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করে নাও। (নাসাঈ হা. ৬০৯, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : যে ব্যক্তির ভাল কাজ তাকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তাকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তি মু'মিন। (তিরমিযী হা. ২১৬৫, সনদ সহীহ)

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

৮. আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

আয়াতটিও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)দের ফযীলতের অধিকারী হওয়ার এবং তাঁদের ঈমান ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জ্বলন্ত প্রমাণ।

وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَى الۡاُخۡرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىۡ تَبۡغِىۡ حَتّٰى تَفِىۡٓءَ اِلٰٓى اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ

৯. আর মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষন না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপোষ মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে- আল্লাহ একথা বলেননি, যখন ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি গোষ্ঠী পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় বরং বলেছেন, "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।" একথা থেকে স্বতঃই বুঝা যায় যে, পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের নীতি ও স্বভাব নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। মু'মিন হয়েও তারা পরস্পর লড়াই করবে এটা তাদের কাছ থেকে আশাও করা যায় না। তবে কখনো যদি এরূপ ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা করা উচিত যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দল বুঝাতেও فرقة শব্দ ব্যবহার না করে طائفة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় فرقة বড় দলকে এবং طائفة ছোট দলকে বুঝায়। এ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটি একটি চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার। মুসলমানদের বড় বড় দলের এতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাও উচিত নয়।

তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও-

এ নির্দেশ দ্বারা এমন সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা উক্ত বিবদমান দল দু'টিতে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে যুদ্ধমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করতে থাকবে আর মুসলমান নিষ্ক্রিয় বসে তামাশা দেখবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা মুসলমানের কাজ নয়। বরং এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের অস্থির হয়ে পড়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণে যার পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তাকে তা করতে হবে। উভয় পক্ষের লড়াই থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করবে। বিবাদের কারণসমূহ জানবে এবং নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।

তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে-

এটাও মুসলমানের কাজ নয় যে, সে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেবে এবং যার প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধরত দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কে এবং অত্যাচারী কে? যে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী তাকে সহযোগিতা করবে। আর যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেহেতু এ লড়াই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই তা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। এটা সেই ফিতনার অন্তর্ভুক্ত নয় যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেনঃ الْقَائِمِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ সে ফিতনার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং বসে থাকা ব্যক্তি

দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। কারণ, সে ফিতনার দ্বারা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে উভয় পক্ষের মাঝে গোত্র প্রীতি, জাহেলী সংকীর্ণতা এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংঘটিত হয় এবং দু'পক্ষের কেউই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিতনার অংশ গ্রহণ করা নয়। বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করা। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এবং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। (আহকামুল কুরআন-জাসসাস) এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ একে জিহাদের চাইতেও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হলো, হযরত আলী (রা.) তাঁর গোটা খেলাফতকাল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন। (রুহুল মাআনী)। এ ধরনের লড়াই ওয়াজিব নয় বলে কেউ যদি তার সপক্ষে এই বলে যুক্তি পেশ করে যে, হযরত আলীর (রা.) এসব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আরো কতিপয় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেননি তাহলে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। ইবনে উমর নিজেই বলেছেনঃ "কোন বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।"

সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটাই নয় যে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই হবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তার অত্যাচার নিরসন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট তার চেয়ে কম শক্তিও প্রয়োগ করবে না আবার বেশীও প্রয়োগ করবে না। এ নির্দেশে সেই লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন নিরসন করতে সক্ষম।

যদি সীমালঙ্ঘনকারী দলটি তোমাদের যুদ্ধের পর আল্লাহর কিতাবের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসে, তবে তার এবং যে দলটি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে মীমাংসা করে দাও। এর অর্থ হলো, তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। আর এটাই আল্লাহর কিতাবের বিধান, যা তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য ন্যায়বিচার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

১০. মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

এটি পূর্বের নির্দেশেরই তাকীদ স্বরূপ। অর্থাৎ, মু'মিনরা যখন পরস্পর ভাই ভাই, তখন তাদের সবার মূল বস্তু হল ঈমান। এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে। জারীর ইবন আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাই'আত" নিয়েছেন। এক, সালাত কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।" [বুখারী: ৫৫]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফারী।" [বুখারী: ৬০৪৪, মুসলিম: ৬৩] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।" [মুসলিম: ২৫৬৪, কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী: ১৯২৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। [মুসনাদে আহমাদ: ১৬/২৯৭, ৭৭৫৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৪০]

অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে । [বুখারীঃ ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬]

আরো একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। [বুখারী: ২৬৪৬, মুসলিম: ২৫৮৫] অন্য হাদীসে এসেছে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না আবার তাকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে না। [বুখারী: ২৪৪২, মুসলিম: ২৫৮০]

অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। [মুসলিম: ২৬৯৯] হাদীসে আরো এসেছে, কোন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোআ করে তখন ফেরেশতা বলে, আমীন। (কবুল কর।) আর তোমার জন্যও তদ্রূপ হোক। [মুসলিম: ২৭৩২]

ফুটনোট

প্রথম পর্ব: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান

সূরার সূচনা হয় মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শিষ্টাচার শেখানোর মাধ্যমে। আল্লাহ বলছেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না।"
এই একটি বাক্যই ঈমানের মূল ভিত্তি—পূর্ণ আত্মসমর্পণ—স্থাপন করে। এর অর্থ হলো:

- **আনুগত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়:**
  কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সিদ্ধান্ত আসার আগে নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিও না বা মতামত দিও না। তাদের কথা ও কাজের উপর নিজের কথা বা কাজকে প্রাধান্য দিও না।
- **রাসূলের (ﷺ) প্রতি যথাযথ সম্মান:**
  এরপর আল্লাহ রাসূলের (ﷺ) সাথে কথা বলার আদব শিখিয়ে দেন: "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো,

তাঁর সাথে সেভাবে কথা বলো না।" কারণ, এই সামান্য বেয়াদবিও মানুষের সকল সৎকর্মকে অজান্তেই নিষ্ফল করে দিতে পারে।

দ্বিতীয় পর্ব: সামাজিক সংহতি এবং গুজব প্রতিরোধের নীতিমালা

এই পর্বে সূরাটি একটি সুস্থ ও সংহত সমাজ গঠনের জন্য কিছু অপরিহার্য নীতিমালা প্রদান করে, যা পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে এবং বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে।

- **সংবাদ যাচাইয়ের অপরিহার্যতা:**
  "হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোনো فاسق (সত্যত্যাগী) তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা ভালোভাবে যাচাই করে নাও।" যাচাই না করে কোনো সংবাদের উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নিলে এমন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, যার জন্য পরে অনুশোচনা করতে হবে। এটি গুজব ও মিথ্যা সংবাদ প্রতিরোধের এক চিরন্তন মূলনীতি।

- **মুসলিমদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা:**
  "যদি বিশ্বাসীদের দুটি দল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" যদি একদল সীমালঙ্ঘন করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দিতে হবে।

- **ঈমানী ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা:**
  এরপরই আসে ইসলামের অন্যতম সুন্দর ও শক্তিশালী ঘোষণা: "নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং, তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক সংশোধন করে দাও।" এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনই মুসলিম উম্মাহর শক্তির মূল উৎস।

শিক্ষণীয় বিষয় :

- দীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নিজের মতকে প্রাধান দেয়া।
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কথাবার্তা বলার শিষ্টাচার জানতে পারলাম।
- দীনে বিদ‘আত সৃষ্টি করা আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলের অগ্রগামী হওয়ার শামিল।
- আলেম-উলামা ও ধর্মীয় নেতাদের সম্মান করতে হবে তবে সম্মান করতে গিয়ে যেন বাড়াবাড়ি না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।
- যে কোন সংবাদ তড়িঘড়ি করে গ্রহণ না করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করা উচিত। তবে আল্লাহ তা‘আলা যে সংবাদ দিয়েছেন তা যাচাইয়ের ঊর্ধ্বে।
- সাহাবীদের ব্যাপারে এমন কথা বলা উচিত নয় যাতে তাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
- মু’মিনদের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে আপোষে মীমাংসা করে দেয়া ওয়াজিব।
- মু’মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের চেয়ে সুদৃঢ়।
- বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন আবশ্যক।
- আল্লাহ তা‘আলা ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন, ভালবাসা আল্লাহ তা‘আলার একটি সিফাত।
- কবীরা গুনাহ করলেও মু’মিন ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, মুসিলমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কবীরা গুনাহ, তারপরেও আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন বললেন।